২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম : বাঙালীর মৃত্যু

২০ সে জুন ১৯৪৭ বাঙলার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বাঙলা ভাগের পরিকল্পনা গৃহীত হয় । ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধে বাঙলার যে শিক্ষিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী অংশ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাত্র ৪ দশকের ব্যবধানে বাঙলার সেই শিক্ষিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী অংশ দেশভাগের পূর্বে ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করার পক্ষে সংবদ্ধ আন্দোলন চালায় এবং প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বাঙলা ভাগ মেনে নেয় । সেই অর্থে আজকে ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস বটে কিন্তু একই সাথে নেহেরু ,প্যাটেল ,,জমিদার শ্রেণী , মারোয়াড়ী লবি'র ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং শ্যামাপ্রসাদবাবুর উগ্র জাতীয়তাবাদের কাছে সমগ্র সাধারণ বাঙালীর পরাজয়ের দিন । তাঁর অর্থ এই নয় যে একই অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত ঢাকার নবাব এবং উচ্চ বংশীয় মুসলিম লীগের নেতারা চুপচাপ বসে ছিলেন বরংসমপরিমাণ তৎপরতায় তারাও হিন্দুদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি না করে নিজেদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার স্বার্থে দেশভাগের পক্ষে সায় দেন ।

শেষ চেষ্টা একটা হয়েছিল বটে । ১৯৪৭ সালে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী যেরকম শরৎ চন্দ্র বসু , সুরাবর্দি , কিরণ শঙ্কর রায় , আবুল হাসিম , সত্য রঞ্জন বক্সী এবং মোহাম্মদ আলি চৌধুরী বাঙলা ভাগের বিরোধী "সংযুক্ত স্বতন্ত্র বাঙলার " স্বপক্ষে দাবী পেশ করতে থাকেন । সুরাবর্দি এবং শরৎ চন্দ্র বসু বাংলার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের এক কোয়ালিশন সরকার গঠন করে বাংলার জনতাকে সাম্প্রদায়িক লাইনে বঙ্গ ভঙ্গের বিরোধিতা করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন, সাক্ষরিত হয় বেঙ্গল প্যাক্ট । ২৭ সে এপ্রিল ১৯৪৭ সালে সুরাবর্দি দিল্লীতে এক প্রেস কনফারেন্স এই স্বতন্ত্র অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনা পেশ করেন । ২৯ সে এপ্রিল আবুল হাসিম কোলকাতায় সমরূপ ইচ্ছা প্রকাশ্য করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন । একই সময়ে ১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল খ্যাতিমান বাঙালী নিম্নবর্ণ নেতা এবং তৎকালীন ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানান, বাঙলার নিম্নবর্ণ হিন্দুরা বাঙলা ভাগের প্রস্তাবের বিরোধী। কিন্তু অন্যদিকে প্যাটেল সার্বভৌম বাঙলার দাবীকে বর্ণনা করেন ' একটা ফাঁদ হিসাবে যেখানে কিরণ শঙ্কর রায় শরৎ বসুর সঙ্গে আটকা পড়বেন ' । পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ততদিনে বিধান রায়ের নেতৃত্বে দিল্লী লবির অনুগত দাসে পরিনত । ইতিমধ্যে কুখ্যাত কোলকাতা রায়ট দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন রেখা গভীর এবং প্রায় অলঙ্ঘনীয় করে তুলেছে । এই সময়ে বর্ধমান মহারাজের সভাপতিত্বে হিন্দু প্রধান জেলাগুলির আইনপ্রনেতারা এক বৈঠকে ৫৮ জন বিভাজনের পক্ষে ভোট দেন কিন্তু সেই সভাতেই মুসলিম লীগের ২১ জনা বিভাজনের বিপক্ষে ভোট দেন। ৫৮ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষ আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো ভারতে যোগদান করবে। অন্যদিকে, মুসলিমপ্রধান জেলাগুলোর আইনপ্রণেতাদের মধ্যে ১০৬ জন যার মধ্যে ১০০ জন ছিলেন মুসলিম লীগের, ৫ জন ছিলেন নিম্নবর্নের হিন্দুদের প্রতিনিধি এবং এক জন ছিলেন খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি বাঙলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দেন। বাকি ৩৫ জন পক্ষে ভোট দেন। পরবর্তীতে বর্ধমান মহারাজের সভাপতিত্বে হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোর আইনপ্রণেতাদের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে ১০৭-৩৪ ভোটে মুসলিমপ্রধান এলাকার আইনপ্রণেতারা প্রস্তাবিত পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য, বেঙল ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে তাল মিলিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার বেঙল শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনপ্রণেতারা বাঙলা ভাগের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন ।

মুসলিম লীগের এক বিপুল অংশ এবং বাঙলার নিম্নবর্ণ মূলত নমঃশূদ্র হিন্দুরা বাঙলা ভাগের প্রস্তাবের বিরোধী হলেও ,কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবংকমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার বেঙল শাখার আগ্রহে ,নেহেরু প্যাটেল লবির কাছে শরৎ চন্দ্র বসু , সুরাবর্দি , কিরণ শঙ্কর রায় , আবুল হাসিম , সত্য রঞ্জন বক্সী এবং মোহাম্মদ আলি চৌধুরী বাঙলাভাগের বিরোধী সংযুক্ত স্বতন্ত্র বাঙলার স্বপ্ন পরাজিত হয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ চক্রান্তের বিরুদ্ধে ,বাঙলা ভাগের বিরুদ্ধে যে বাঙালী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলল সেই একই বাঙালী ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ মেনে নিলো কেন ? এর

উত্তর লুকিয়ে আছে অর্থনৈতিক আধিপত্য ,দীর্ঘকাল যাবত সমস্ত সামাজিক বিষয়ে ক্ষমতার আধিপত্য , সাংস্কৃতিক আধিপত্য, শিক্ষার আধিপত্য এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক আধিপত্য হারানোর উদ্বেগের ধারাবাহিক সত্যের মধ্যে ।

এখন ব্যবসা বা শিল্প বাঙালী ভদ্রলোকদের সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিলোনা -তাদের সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল ভূমি । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সম্পত্তির সাথে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তার অপরিহার্য উপজাত ফল হোল এই উচ্চবর্ণ বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণী । খাজনা আদায় কারি ,জমির পত্তনি স্বত্ব দেওয়ার অধিকারী ঠাকুর পরিবারের মত বড় জমিদার থেকে তালুকদার পর্যন্ত সবাই ছিল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । তারা জমিতে কাজ করত না , জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা দিয়েই তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হত -ভদ্রলোক হোল দেশের অনুভূতিহীন মাটির সন্তানদের ঠিক বিপরীত ,কায়িক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকাকে এই বাবু শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ও সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অপরিহার্য উপাদান বলে বিবেচনা কোরত । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এই আয় কমে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায় । কৃষি পণ্যের উৎপাদনের হার ক্রমেই কমে আসতে থাকে ,চাষের আওতায় অনাবাদী জমি আনার প্রয়াস ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে । ১৮৮৫ সালে জমিদারের ক্ষমতা সীমিত করবার আইন প্রণয়ন হয় ,জমির খাজনা থেকে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া শুরু হয় । ভদ্রলোক শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষা কে আয়ের বিকল্প সূত্র হিসাবে আঁকড়ে ধরা শুরু করে ।ভদ্রলোক হিন্দুরা মনে করতে শুরু করে পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের জন্যই সংরক্ষিত , সে কারনে তারা ঐ মাথাভারি শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতটিকে বিস্তীর্ণ করবার প্রয়াস কে তীব্রভাবে বাধা দিতে শুরু করে -কারন নিম্ন পর্যায়ের লোকেদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হোলে তাদের একচেটিয়া অধিকার হ্রাস পেতে পারে । বিংশ শতাব্দীতে ভদ্রলোকেদের পরিচিতি সম্পদের আভিজাত্যর সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আভিজাত্যে পরিবর্তিত হতে থাকে -তারা সংস্কৃতিবান ,আলোকিত ,বেঙ্গল রেনেসাঁর উত্তরাধিকারী অগ্রগতি এবং আধুনিকতার পতাকাবহন কারি সুতরাং বাঙলার রাজনীতি ,সমাজনীতি ,অর্থনীতি ,শিক্ষানীতি সমস্ত বিষয়ে তাঁদের মাতব্বরি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া শুরু করে ।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুইএর দশক থেকে বাঙলায় এই চিত্র দ্রুত পাল্টাতে থাকে সব থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি ঘটে চিরাচরিত কৃষি ভিত্তিক পেশার পরিবর্তে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব । শিক্ষা ,চাকরী ,সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে এই মুসলমান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ক্রমশ লক্ষিত হতে থাকে । ১৮৭০/৭১ সালে বাঙলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৪% ছাত্র ছিল মুসলমান অথচ ১৯২০/১৯২১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় প্রায় ১৪-১৫ % । বাংলার কোন কোন অঞ্চলে যেমন ঢাকা ,হুগলী এমনকি প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যার সমপরিমাণ এমনকি কোথাও কোথাও বেশি হয়ে দাড়ায় । আর এই নব্য শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তীতে বাঙলার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে । মুসলমানদের এই অভাবনীয় অগ্রগতি তাদের হিন্দু কাউন্টার পার্টের সাথে প্রতিযোগিতা একই সাথে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ক্রমে বাঙলায় হিন্দু জনসংখ্যা কে পেছনে ফেলতে শুরু করে । ১৯৩১ সালে বাঙলায় মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৫৪.২৯% । পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা । বাঙলার অধিকাংশ জেলায় তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ,নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের মধ্যে এক প্রত্যয়ের জন্ম দেওয়া শুরু করে । অপ্রত্যক্ষ ভাবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান , হিন্দুদের সাথে বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে দর কষাকষি , রিজার্ভ সিট ,মুসলিম কোটার অধিকারের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে হিন্দু আধিপত্যের সাথে মুসলমানদের সূক্ষ্ম সংঘাতের সূত্রপাত হতে শুরু হয় ।

১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ডের সম্প্রদায়ভিত্তিক রোয়েদাদের ফলে প্রদেশে নাটকীয় ভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায় । প্রায় একই সাথে ঘোষিত হয় পুনা প্যাক্ট ,প্রাদেশিক আইনসভায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পরে , ‘ মুসলমানদের কাছে তাদের চিরস্থায়ীভাবে অধীনতা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি হয়ে পরে । একই সাথে কৃষিজাত পণ্যের

মূল্য ও গ্রামীণ ঋণ আকস্মিক ও নাটকীয় ভাবে কমে যাওয়ায় খাজনা ও পাওনা আদায়ের পদ্ধতির ওপরে মারাত্মক চাপ পড়ে -অথচ এইগুলিই ছিল এতকালের আয়ের উৎস। খাজনা আদায়ে খাজনা আদায়কারিরদের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি রায়তদের অনুকূলে চলে যেতে থাকে আর এই রায়তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে রায়তরা ক্রমবর্ধমান হারে জমিদারদের কর্তৃত্ব অবজ্ঞা করে গ্রামীণ বাঙলায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে থাকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন উচ্চ শ্রেণীর কৃষকদের ভোটের অধিকার দেয় -এই প্রথম মুসলমান চাষি আইনসভার পরিমণ্ডলে নিজেদের কথা বলার অধিকার পায়।মুসলমান রায়ত এবং মুসলমান বুদ্ধিজীবি এই প্রথম বাঙলার রাজনীতিতে এতকালের মধ্যসত্বভোগি, খাজনা আদায়কারী সুদ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জাতীয়তাবাদী ইস্যুর ওপর ভদ্রলোক শ্রেণীর স্বার্থ প্রাধান্য বিস্তারের প্রাসঙ্গিকতার কারনে এবং এই আশু বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বার্থে ক্রমে কংগ্রেস ,মূলত বেঙ্গল কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় ডানপন্থীদের দখলে চলে যায় ,এই সময়ে বাঙালী ভদ্রলোক সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনকে অত্যন্ত অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করে। মুসলিম শাসন কে হিন্দু সমাজের পক্ষে মারাত্মক ও তাৎক্ষনিক হুমকি হিসাবে দেখার সূত্রপাত শুরু হয়।সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উচ্চ ভদ্রলোক শ্রেণী মুসলমান শাসন মেনে নেয় কি উপায়ে -সৃষ্টি হতে শুরু করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বাদ। নিজেদের শক্তি বাড়ানোর উদ্দ্যেশ্যে এতকালের অবহেলিত দলিতদের শুদ্ধি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের মধ্যে স্থান দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয় , ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গঠনের প্রয়াস। অধস্তন মুসলমানদের শাসনকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি ,বিভাগের দাবী ও পৃথক আবাসভূমির স্বার্থে ভদ্রলোকেরা বেঙ্গল কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা কে প্রকৃত অর্থে নিয়োজিত করে। বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব যা এককালে জাতীয় রাজনীতির নির্ণায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ক্রমে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ,আঞ্চলিক ,সংকীর্ণ, গোষ্ঠী বিভক্ত এবং দিল্লী কংগ্রেসের আজ্ঞাবাহক হয়ে পড়ে। এমন একটা সময় ছিল যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব অখণ্ড ভারতের কোন একটা অংশের বিচ্ছিনতা অভিশাপ হিসাবে বিবেচনা করতেন কিন্তু সেই কংগ্রেস ১৯৪৬ এর কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে মাত্র 1.3%মুসলমান ভোট পায়। বাঙলায় ২৫০ টি আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ ১১৩ টি আসন দখল করে ক্ষমতা দখল করে। এই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস দেশের এমন সব অংশ ছেড়ে দিতে চায় যেখানে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আশা নেই এবং কেন্দ্রে তাঁদের ক্ষমতার প্রতি হুমকি হিসাবে প্রতীয়মান কিন্তু তারা সাবেক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ জেলাগুলো ভারতের সাথে রাখতে হবে এই দাবী তোলে এবং দাবীর অর্থ বাঙলা এবং পাঞ্জাব অবশ্যই ভাগ হতে হবে।

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস বাঙলায় বর্ণ হিন্দুদের সর্ব সম্মত পছন্দের দল হিসাবে গণ্য হয় - হিন্দু মহাসভা মাত্র 2.73% ভোট পায় এবং শ্যামাপ্রসাদ ইউনিভার্সিটি বিশেষ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। কিন্তু মহাসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিপুল বিজয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের বিজয় ছিলোনা বরং কংগ্রেসের ওপরে বাঙালী হিন্দুদের বিস্বাশ দৃঢ় ছিল যে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার তুলনায় তাঁদের স্বার্থ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ সুরাবর্দি'র নেতৃত্বে পুনরায় ক্ষমতায় আসে -হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রত্যাশা হতাশায় পরিনত হয় -অন্যদিকে সুরাবর্দি মন্ত্রসভায় হিন্দু মুসলমান সমতা'র পূরানো ফর্মুলা বাতিল করে মন্ত্রীসভা ১৩ জন থেকে মাত্র ১১ জনে নামিয়ে আনেন এবং হিন্দু মন্ত্রীদের সংখ্যা ৩ এ নামিয়ে আনেন তার ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে এই তিনজন হিন্দু মন্ত্রীর মধ্যে দুই জন কে তপশীল সম্প্রদায় থেকে গ্রহণ করেন। হিন্দু ভদ্রলোকেরা একেতে পরাজিত ,তার ওপর ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময়ের খাদ্যমন্ত্রি সুরাবর্দি বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী , তার মন্ত্রীসভায় মাত্র একজন মন্ত্রী হিন্দু উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি , এই অপমান অসহ্য হয়ে ওঠে। বাঙলা ভাগের ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের যৌথ আন্দোলনে কংগ্রেস অগ্রণী ভূমিকায় ছিল। সারা বাঙলায় বাঙলা ভাগের জন্য

৭৬টি জনসভা সংগঠিত হয় তার মধ্যে কংগ্রেস একাই ৫৯ টি জনসভা সংঘটিত করে ,বারোটি মহাসভার উদ্যোগে আর মাত্র ৫টি সভা মহাসভার সাথে যৌথ ভাবে সংগঠিত হয় । ভদ্রলোকেরা ছিল এই আন্দোলনের মুল শক্তি , এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । বস্তুত প্রাদেশিক রাজনীতিতে ক্ষমতা হারিয়ে ,জমিদারি পদ্ধতির দ্রুত অবক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হতাশ ভদ্রলোক গ্রুপ তাদের এতকালের সুযোগ সুবিধা ক্ষমতা বজায় রাখতে স্বীয়শক্তি নিয়োগে তৎপর হয়ে ওঠে ।

অন্যদিকে বাঙলার মারোয়াড়ী এবং বাঙ্গালী কোটিপতি ব্যবসায়ীরা মুসলমান বনিকদের ক্ষমতা প্রতিহত করতে সর্বশক্তি দিয়ে উঠে পড়ে লাগেন । বিড়লা ,ঈশ্বর দাস জালান , গোয়েঙ্কা ,নলিনী রঞ্জন সরকার -বাঙলার এইসমস্ত কোটিপতি প্রতিটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে উপস্থিত থেকে দেশভাগের সমর্থনে আন্দোলন পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করতেন । বাঙলার সমস্ত এলাকা থেকে মারোয়াড়ী ব্যবসাদারেরা সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের কাছে দরখাস্ত প্রেরণ করেন , তারা bolen' যে ' মুসলিম লীগের সরকারের অধীন বাঙলায় ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং তারা বাঙলা বিভাগের প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে সমর্থন করে' । কলকাতার মারোয়াড়ীদের কাছে বাঙলা বিভাগ তাঁদের স্বার্থের পক্ষে অতি উত্তম - অধিকাংশ মারোয়াড়ী পাটের ফাটকা বাজারে প্রভূত অর্থ উপার্জন করলেও পাটশিল্প কে ততদিনে তারা মেরে ফেলতে শুরু করেছে । তাদের মধ্যে আনন্দিলাল পোদ্দার ,কারনানি ,ঝুনঝুনওয়ালা , শেঠরা কয়লাখনি তে বিপুল বিনিয়োগ শুরু করেছে । বিড়লারা চিনি ,বস্ত্র ,ব্যাংকিং ,বিমা ,ক্যেমিকাল শিল্পে ভারতজুড়ে বিনিয়োগ করছে কলকাতার পাট শিল্পের মৃত্যুর বিনিময়ে । অন্যদিকে সুরাবর্দি হাসান ইস্পাহানী গ্রুপের আর্থিক ক্ষমতার ওপরে নির্ভরশীল । অবিভক্ত বাঙলা মারোয়াড়ীদের ব্যবসা বিস্তৃতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে । মুসলিম লীগের অধীনে থাকলে তাদের উন্নতির সম্ভাবনা সীমিত অন্যদিকে বাঙলায় কংগ্রেস সরকার স্থাপিত হোলে সরকার তাদের পকেটে থাকবে এই নিখুঁত ব্যবসায়িক স্বার্থে বিড়লা এবং সমস্ত মারোয়াড়ী সম্প্রদায় বাংলাভাগের সমর্থনে তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা (আর্থিক ক্ষমতা সমেত) নিয়োজিত করে ।

মূলত জমিদার ,পেশাজীবী ,বাঙলার অসংখ্য সম্মানীয় চাকুরীজীবী ,মধসত্ব ভোগী উচ্চ বর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক ,মারোয়াড়ী ব্যবসাদার এবং দিল্লীর কংগ্রেস লবির ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বাঙ্গালী পরজিত হয় আজকের দিনে । তৎপরবর্তী দুই দশকের ইতিহাস ,বঞ্চনা স্বজন হারানোর বেদনা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যগত দুর্বলতা, বাম ডানের মধ্যে শক্ত মেরুকরণ এবং এখনো অনেক হিন্দু ভদ্রলোক কর্তৃক উৎকট স্বাদেশিক সংস্কৃতির অব্যহত চর্চা সেই হিন্দু বাঙালী সাম্প্রদায়িকতার ধারবাহিকতা । জাতীয়তাবাদ বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে দেশে দেশে আর বাঙালী ভদ্রলোকের সাম্প্রদায়িকতা পরিচালিত হয়েছে নিজেদেরই জাতির বিরুদ্ধে তার সাথে সুচতুর পরিকল্পনা অনুযায়ী সঙ্গত করেছে মারোয়াড়ী সম্প্রদায় । এখনো আমাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমানদের বাঙালী বলে স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত এবং কতিপয় স্বার্থান্ধ মতবাদ প্রচারকারী প্রদেশ ভাগের থেকেও মারাত্মক বাঙালী জাতির ভবিষ্যতকেই হুমকি দিচ্ছে অবিরত ।

আজ কোন আনন্দের দিন নয় -হিন্দু বিজয়ের দিন নয় বরং অতি সংখ্যালঘিষ্ঠ ভদ্রলোক বাঙালীর হাতে আপামর বাঙালীর পরাজয়ের দিন । স্বজন এবং স্বদেশ হারানোর দিন ।